মজার কেরামতি

জলধর মল্লিক

উলের কেরামতি

জলধর মল্লিক

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০

Sunyer Keramati
by Jaladhar Mallick

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
এস পি কমুনিকেশনস্ প্রা লি
৩১/১এ ওল্ড বালিগঞ্জ ফার্স্ট লেন
কলকাতা ৭০০ ০১৯

প্রচ্ছদ
শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

দাম : কুড়ি টাকা

লেখকের কথা

গণিতের রাজ্যে শূন্য দেখায় নানান কেরামতি। কেন দেখায়, কখন দেখায়, কেমন করে দেখায় — সে খবরটা জানতে পারলে গোনাগুনতির ব্যাপারটাই হয়ে যায় জলের মতো সোজা। ভয়ের বদলে গণিতকে তখন জয় করতে ইচ্ছে করে। তেমন হ'লে তো জানার দুনিয়াটাই হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ছোটদের তখন এগিয়ে যেতে কেউ ঠেকাতে পারবে না। 'শূন্যের কেরামতি' বইটি ছোটদের জন্যে লেখা হয়েছে সেই কারণেই। ছোটদের ভালো লাগলে, কাজে লাগলে — বইটি লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। ছোটদের কথা মনে রেখে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি বইটিকে প্রকাশ করার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ আর ৯-কে নিয়ে আরো তিনটে এমন ধারার মজাদার বই বেরুবে শিগগিরই ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে। আশা করি, বইগুলো ছোটদের ভাল লাগবে, কাজে লাগবে।

জলধর মল্লিক

কলকাতা

সেপ্টেম্বর ২০০০

নামটি তার শূন্য

কেউ করে না গণ্য,

কারোর পিঠে

চড়লে পরে

তবেই হন মান্য।

কথাটা কি বেঠিক?

মোটেই না — বরং বলা যায় একশ ভাগ ঠিক।

লাখ কথার এক কথা।

শূন্য কথাটা শুনলে — মনটা কেমন নেই-ঠিকানা হয়ে যায়। কেমন যেন 'নেই' 'নেই' ভাব। যেন কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা। সব কিছু কেমন যেন 'ফাঁকা' 'ফাঁকা'। তাই না?

হবেই তো। শূন্য কথাটার আসল মানেই যে - কিচ্ছু নেই। যে নেই — তাকে বোঝানো কি চাট্টিখানি কথা। মুস্কিল আসানের জন্যে রয়েছে গোল্লা। গোল্লা দিয়ে বোঝাতে হয় শ্রীমান শূন্যভায়াকে। আহা — কেমন গোলগাল চেহারা!



দেখতে চেহারাটা গোলগাল হলে হবে কি — আসলে তো ফোঁপরা। ফাঁকা। যেন মূর্তিমান সর্বহারা গোনাগুনতির রাজ্যে।

কিছু নেই হাতে
কথাটা বোঝাতে,
গোল্লা আঁকতে হয়
গুনতি মেলাতে।

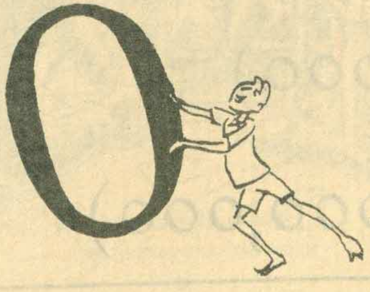
তাহলে কি দেখা যাচ্ছে —?

দেখা যাচ্ছে মানুষের রাজ্যে যেমন সর্বহারা মানুষ আছে —তেমনি গোনাগুনতির রাজ্যেও আছে সর্বহারা, মানে সব হারা অঙ্ক।

অ-ঙ-কো—?

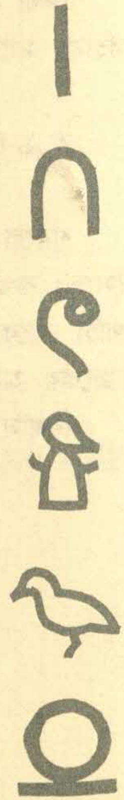
শুনলে কেমন যেন আতঙ্ক হয়। তাই-না? ভয় লাগে। 'আঁকা' থেকেই তো 'আঁক' কথাটা এসেছে। কথায় কথায় বলি না আমরা — 'আঁকাবুকি', 'আঁকাজোকা'। এ সবই তো এসেছে 'আঁকা' কথাটা থেকে। আঁকতে কার না ভালো লাগে? আসলে — অঙ্কও তো এক রকমের ছবি। ছবি থেকেই আজকের অঙ্কের চেহারাগুলো তৈরি হয়েছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

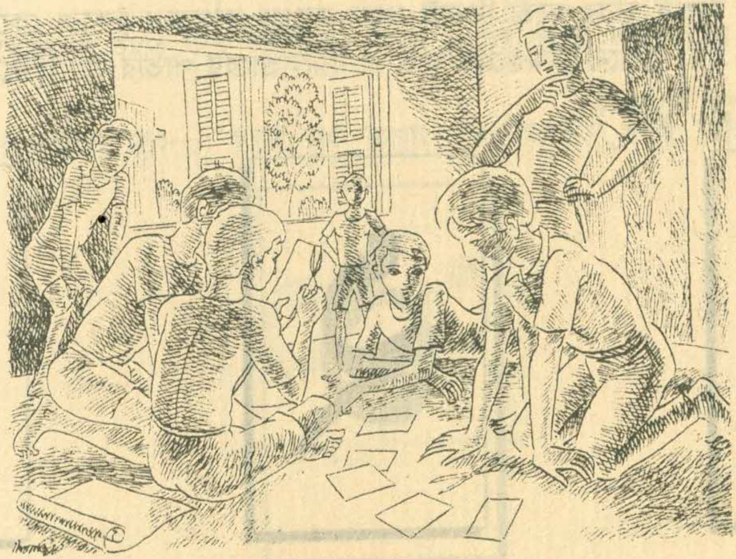


প্রাচীন মিশরে সংখ্যার চেহারা

এক (০)	=	
দশ (১০)	=	
শত (১০০)	=	
হাজার (১০০০)	=	
লক্ষ (১০০,০০০)	=	
কোটি (১০,০০০,০০০)	=	



তা বেশ। তাহলে পাশের ছবিটা দেখ। আজ থেকে প্রায় পাঁচ সাড়ে-পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখন মিশরে এই রকম ছবি এঁকে গোনাগুনতির কাজ চলত। ঐ সময় বা তার কিছু পরে আমাদের ভারতে গড়ে উঠেছিল এক চোখ-ধাঁধানো সভ্যতা। সিন্ধুনদের তীরে গড়ে উঠেছিল বলে একে কী বলা হয় জানো? বলা হয় — সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা। নগরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এটা। এমন দুটো নগরের কথা খুব শোনা যায়। নগর দুটো হ'ল — মহেন্‌জোদড়ো আর হরপ্‌পা। দাঁড়ির পর দাঁড়ি এঁকে গোনাগুনতির কাজ চালাত সেই সময় ওখানকার মানুষেরা। আসলে আঁককে ভয় করার কিচ্‌-ছু নেই। ভয় না করে এগিয়ে গেলে দারুণ মজা পাওয়া যায়। খেলা যায় মজার খেলা।



আঁক নিয়ে মজার খেলা

এখন বরং আঁক নিয়ে একটা মজার-খেলা খেলা যাক।

আসলে — শূন্য হ'ল একটা ভারি মজার আঁক। ওর মাঝে লুকিয়ে আছে কত যে হাজারো মজা। সেই মজার সুলুক সন্ধান যে পেয়েছে — সেই মজেছে দারুণভাবে। কথাটা না-হয় পরখ করেই দেখা যাক হাতেনাতে। তাহলে শুরু করা যাক মজার খেলাটা।

সবার আগে নিচের ছবির মতো তিনটে সমান মাপের কাগজের টুকরো কেটে নাও। একটু পুরু কাগজ হলে ভালো হয়। পুরানো নেমন্তন্নের কার্ড বা ক্যালেন্ডারের পাতার উল্টোপিঠের দিকটা এ কাজে লাগানো যেতে পারে নিখরচায়।

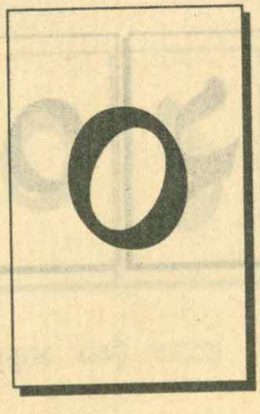


তিনটে সমান মাপের কাগজ কাটার পর — একটাতে ১, একটাতে ২ আর শেষেরটাতে ০ লিখতে হবে একটু বড় করে— এই যা। খেলা এখন রেডি। খেলোয়াড়ও তৈরি। কিন্তু খেলা দেখার লোক কই? খেলা দেখার লোক না-থাকলে কি আর খেলা জমে? চটজলদি দু-একজন বন্ধুকে ডেকে নিলেই হয়। ভূতকে ভয় নেই — কিন্তু অঙ্কের নাম শুনলে ডরে — এমন বন্ধু পেলে খেলার মজা বেড়ে যাবে দশ গুণ।

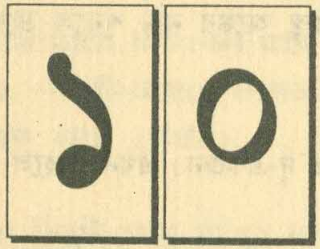
ধরা যাক — বন্ধু পাওয়া গেছে দু-একজন। এখন তাহলে খেলাটা শুরু করা যেতে পারে দিব্যি।

আগে ০ লেখাটা বাঁ হাতে ধরে সাথীদের দেখাও নিচের ছবির মতো করে।

এখন বন্ধুদের শুধাতে হবে— 'কার্ডে কত সংখ্যা লেখা আছে'? সবাই বলবে — শূন্য।

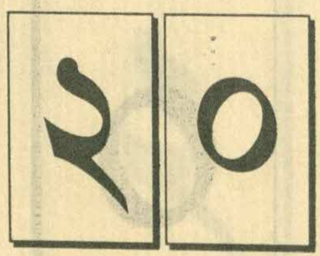


এবার ১-লেখা কার্ডটা ডান হাতে ধরে ধীরে ধীরে ০-লেখা কার্ডের সাথে জুড়ে দাও। নিচের ছবিতে যেমন দেওয়া আছে।



সংখ্যাটা কত হয়েছে শুধালে —সব্‌-বাই বলবে— দশ। ঠিক কথা — দশই তো ওটা।

এবার ১ -লেখা কার্ডের জায়গায় ২-লেখা কার্ডটা বসাও।



কী বলবে বন্ধুরা —?

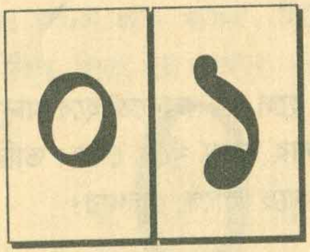
বলবে —বিশ কিংবা কুড়ি।

তাহলে ১-লেখা কার্ডটার জায়গায় ২-লেখা কার্ডটা আনলে সংখ্যাটা বদলে যাচ্ছে। দশ হয়ে যাচ্ছে কুড়ি। এখন এরকম করে যদি ১-লেখা কার্ডের জায়গায় ৩ কিংবা ৪-লেখা কার্ড বসানো যায় — তাহলে কী হবে? হবে — ৩০ কিংবা ৪০। সব্বাই জানে এটা।

এখন সব কার্ড টেবিলে রেখে — শুধু ১-লেখা কার্ড নিয়ে দেখাও বন্ধুদের। শুধাবার আগেই বন্ধুরা বলতে থাকবে — "এক, এক ওটা"।

এবার ১-লেখা কার্ডের আগে ২-লেখা কার্ড বসালে কি হবে? কি আর হবে — ২১ হবে। কে না জানে এটা!

কিন্তু ২-লেখা কার্ডের জায়গায় ০-লেখা কার্ডটা বসালে কী হবে?



ওটা কত? —বন্ধুদের শুধালে শুরুতে একটু ঘাবড়ে যেতে পারে। তবে সামলে নিয়ে নির্ঘাৎ বলবে — 'এটা তো এ-ক'।

শূন্যভায়া এখানে সত্যিই শূন্য। নির্ভেজাল একটা শূন্য। কিচ্-ছু নেই। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ — এই সব কটা আঁকের ডান দিকে ০ থাকলেই মানে আছে। তাইতো বলে—

যদিও 'শূন্য' নাম

আছে তখন দাম,

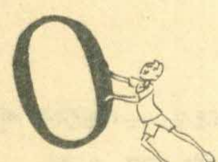
বাড়ে যত কদর

কাড়ে তত আদর।

আর যে কোনো সংখ্যার সবার আগে — মানে যাকে বলে — শুরুতে থাকলে এক্কে বারে জিরো। সব হারা। সর্বহারা। দাম নেই। মানে নেই। কদর নেই। আদর নেই। যাকে বলে — ফেল্না।

কেন এমনি হ'ল? ১ থেকে ৯ এর বেলায় তো এমন হয় না। শুধু শূন্যের বেলায় এমন দুর্ছাই হয় কেন?

এই সব 'কেন'-র জবাব পেতে হলে — জানতে হবে মানুষ কেমন করে গুণতে শিখল। জানতে হবে — কেমন করে শূন্যভায়াকে গোনার জন্যে খুঁজে পেল। ভারি মজার গপ্পো সে সব। সত্যিকারের গপ্পো কিন্তু। বানানো গপ্পো ওর কাছে লাগে কোথায়!



শূন্যকে খুঁজে পাওয়ার গপ্‌পো

সে ধর — হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। যাকে বলে — আদ্যিকালের কথা। মানুষ তখন একটু একটু করে 'মানুষ' হয়ে উঠছে।

হাতটাকে কাজে লাগাতে শিখছে। পাথর ঘষে হাতিয়ার বানাতে শিখছে। দিন যাচ্ছে। রাত যাচ্ছে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে বছর। হাজার হাজার বছর। মানুষও সময়ের তালে তালে নানান কিছু করতে শিখছে। পশুদের লালনপালন করতে শিখছে। চাষবাস করতে শিখছে। ঘরদোর বানাতে শিখছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিখছে। এমনি কত কি করতে শিখছে। আর এসব শেখার জন্যে দরকার হচ্ছে হিসেব টিসেব রাখার। গোনাগুনতির। গোনাগুনতির তাগিদে মানুষ হাতের আঙুল কাজে লাগাতে শুরু করল। শুরু করল মাটির ঢেলা, নুড়ি-পাথর দিয়ে গোনাগুনতির হিসেব। সহজ হিসেবের জন্যে সহজ কায়দা। কিন্তু মানুষ যতই নতুন নতুন জিনিষ তৈরি করতে শিখল — ততই গোনাগুনতির কাজটা বড় হতে থাকল। জটিল হতে থাকল। হিসেবটাকে বেশি দিন ধরে চালু রাখার দরকার পড়ল নানান কাজের জন্যে। কিন্তু লিখে যে রাখবে — তার উপায় নেই।

লিপি — মানে আঁক কই?

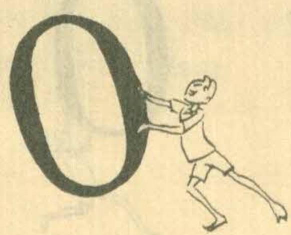


সবই তো চলছে তখন মুখে মুখে। ছেলে শিখছে বাবার কাছ থেকে শুনে শুনে। বাবা শিখেছে তার বাবার কাছ থেকে শুনে শুনে।

তা কথায় আছে-না — ঠেলার নাম বাবাজি। দরকার পড়লে — মানুষ একটা না একটা উপায় খুঁজে বার করবেই। বড় বড় গোনাগুনতির জন্যে, হিসেব রাখার জন্যে — তৈরি করল ছবি। মানে 'আঁক'। এ কথাটা তো আমরা আগেই জেনেছি। আঁক শুধু কিন্তু ছবি নয়। কোনো জিনিসের হিসেব রাখা হচ্ছে — তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে আঁক কেটে জিনিসটার সাদামাটা ছবি এঁকে দেওয়ার কায়দা চালু হ'ল। এ যেন ছবি দিয়ে বোঝানো — ওটা কিসের সংকেত — মানে চিহ্ন।

লিপি বা আঁকও তো এক ধরনের চিহ্ন। কিন্তু মজাটা কোথায়? মজাটা হ'ল লিপির আগেই গোনার চিহ্ন—কিংবা বলা যেতে পারে সংকেত তৈরি করে ফেলল মানুষ। এই সংকেতের-ই আরেক নাম — প্রতীক।

তাহলে ছবি থেকে তৈরি হল সংকেত বা প্রতীক। চারটে গরু বোঝাতে চারটে দাঁড়ি আঁকা হতো।



তার পাশে থাকত গরুর ছবি। গরুর ছবিটা সহজ করার তাগিদে তৈরি হল গরুর একটা সংকেত। এই কায়দার লেজ ধরে তৈরি হল লিপির সংকেত। সোজা কথায় — অক্ষর। তবে এটা হ'ল অনেক পরে। এদিক থেকে ১, ২, ৩, ৪-দের ক, খ, গ, ঘ-দের একরকম বড়দা বলা যায়।

তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?

দেখতে পাচ্ছি — গোনাগুনতির তাগিদেই মানুষ হিসেব রাখার আঁক বা চিহ্ন তৈরি করেছে। তৈরি করেছে — ১, ২, ৩, ৪ জাতীয় আঁক। তৈরি করেছে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ জাতীয় আঁকগুলো। আদ্যিকালের ভারতের মানুষ যেমন এই ধরনের আঁক বার করেছে — তেমনি আরো অনেক দেশও তৈরি করেছে এমন আঁক। নিজের নিজের মতই তৈরি করেছে — যেমন যেমন দরকার পড়েছে। বেশি দূর যেতে হবে না। হাতের কাছেই মজুত রয়েছে জম্পেশ একখানা নমুনা। এখন আমাদের গোনাগুনতির সময় বাংলায় কোন্ আঁকগুলো কেবল ভরসা? সেই আঁকগুলোই ভরসা — যারা হ'ল ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ আর ০। এটাই আবার ইংরাজিতে হ'ল — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, আর 0। চেহারায় অনেক তফাৎ বটে — তবে কাজের বেলা নয়। কোনো ফারাকই নেই তখন। সব

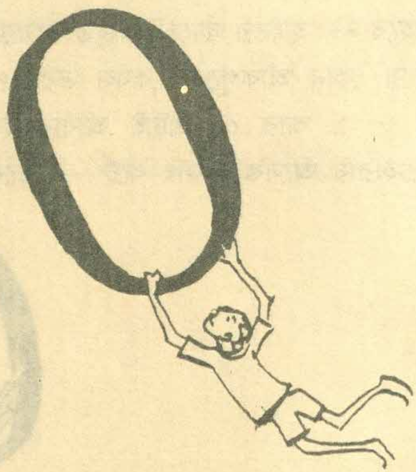


রকম গোনাগুনতি এই দশটা মূর্তিমানকে দিয়েই করা যায়। এ যেন হারাধনের দশটি ছেলে। কিন্তু একটা হারালেই বিপদ। বিপদ মানে মহাবিপদ। গোনাগুনতির বারোটা তখন। গোনাগুনতির বারোটা মানেই গণিতের বারোটা। কেননা গোনার বিদ্যের নামই গণিত।

গণিত কি?

গণিত হ'ল আসলে গণনা বিদ্যা। যেমন আছে — পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা। এই রকমই বিজ্ঞানের একটা শাখা ও। সেরা শাখা। মনটাকে গড়ে পিটে একটা সাচ্চা কাজের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গণিতের জুড়ি মেলা ভার।

গণনা বিদ্যার
নাম যে গণিত,
এতে কোনো ভুল নেই
নেই হার জিৎ।



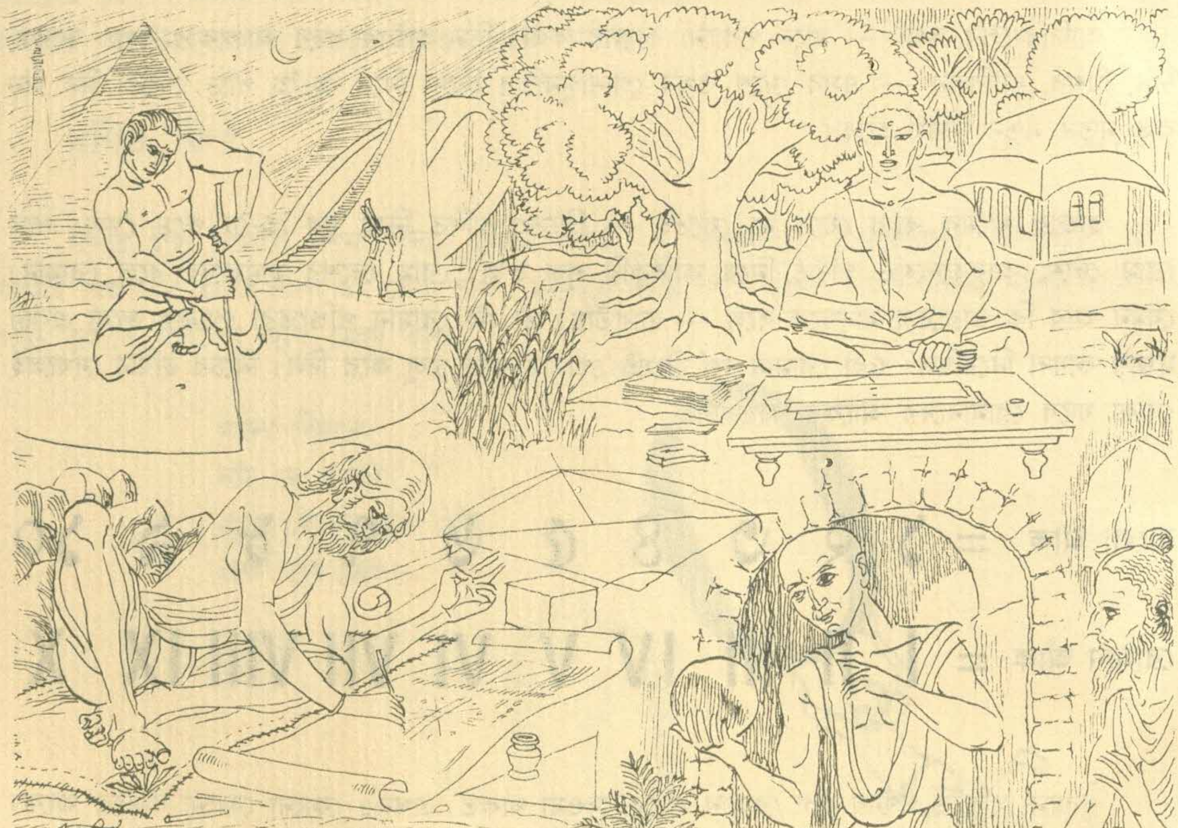
আদ্যিকালের কথা — মানে পুরানো কালের কথা। তিন হাজার বছর আগেকার কথা। ভারত, চীন, মিশর, ব্যাবিলন — এসব দেশে তখন গোনাগুনতির বিদ্যে নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। দিন দিন কত নতুন নতুন নিয়ম হচ্ছে।

হাজার খানেক বছর যেতে না যেতেই — গ্রিসেও গণিত নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরে রোম দেশে, আরবদেশেও গণিত নিয়ে কারিকুরি শুরু হ'ল। রোম দেশের মানুষদের বলে রোমান। যেমন আর কি ভারতের মানুষকে বলে — ভারতীয়। তা এই রোমান পণ্ডিতেরা গোনার জন্যে একটা মজার কায়দা নিয়েছিল। ওরা রোমান বর্ণ দিয়েই গোনার কাজ চালু করে দিল। নিচের ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে রোমানদের আঁকের কায়দাটা।

বাংলা আঁক =	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রোমান আঁক =	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

পুরানো ঘড়িতে ঘণ্টার দাগ রোমান আঁকে দেওয়া থাকত। এখনও কোনো কোনো ঘড়িতে থাকে।

প্রাচীন যুগে গণিত চর্চা



সে যাই হোক — একটা জিনিস নজরে পড়েছে কী? শূন্যভায়া কিন্তু বে-পাত্তা রোমান আঁকে! ১০-এর জন্যে একটা আলাদা লিপি বসিয়েছে চিহ্ন হিসেবে। বসিয়েছে X। এমনি আলাদা আলাদা চিহ্ন বানিয়েছে ৫০, ১০০, ১০০০-এর জন্যে। ১ থেকে ৯-এর প্রতীক তৈরি হয়েছে, কিন্তু শূন্য তখনও শূন্যে। মানুষের মাথায় আসেনি। তৈরি করতে পারেনি গোনাগুনতির জন্যে শূন্যের চিহ্ন। বড় বড় সব সভ্যতা দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে তখন। মিশর, চীন, ব্যাবিলন, ভারত। রোমান কায়দায় ৮৩ লিখতে হলে এমনি চেহারা হবে— LXXXIII। পেল্লায় চেহারা। হবেই তো। আলাদা আলাদা সংখ্যার আলাদা আলাদা চিহ্নের জন্যেই এই দশা। ৫০-এর জন্যে L। তার পর ৩০-এর জন্যে XXX, মানে তিনটে দশ। এরপর বাকি ৩-এর জন্যে III চিহ্ন। তবে হ'ল ৫০+৩০+৩ = ৮৩। শূন্য গেল কই? শূন্যের কথা কেউ জানত না তখনও। অথচ পাটিগণিত, জ্যামিতি, গ্রহ, তারাদের হিসেব রাখার কায়দা জেনে গেছে। বড় হিসেব হ'লে কী করত তখন? যেমন ধরা যাক — দুশো চারটে ঘোড়া আছে কারো। তাই এই হিসেবটা সংখ্যায় লিখবে কিভাবে — যদি শূন্য না থাকে? তাই—২০৪-এর বদলে অনেক কায়দাকানুন করে ওই সংখ্যাটা বোঝাত। বড় সংখ্যা বোঝাতে ভীষণ ঝামেলা পোয়াতে হতো। লিখতেও হতো বেশ বড় করে।



কাজটা সহজ করে দিল আদ্যিকালের ভারতের পণ্ডিতেরা। স্রেফ শূন্যটা তৈরি করে। দশ লিখতে হ'লে ১-এর পিঠে চড়িয়ে দাও একটা গোলগাল ০। হয়ে গেল ১০। একশ লিখতে হ'লে চড়িয়ে দাও দুটো ০। ব্যাস — হয়ে গেল ১০০। তেমনি তিনটে ০ চড়ালে হবে ১০০০। ১০০০-কে তো 'এক হাজার' বলেই ডাকে মানুষ।

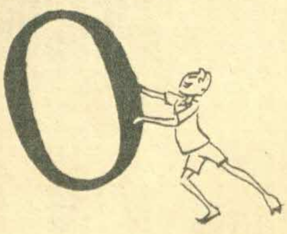
আচ্ছা — একটা জিনিস নজরে পড়েছে কী? একটা ০ বাড়ালেই সংখ্যাটা ১০ গুণ বেড়ে যাচ্ছে।

১ x ১০ = ১০
১০ x ১০ = ১০০
১০০ x ১০ = ১০০০
১০০০ x ১০ = ১০০০০

অন্য আঁক দিয়ে এই কাণ্ডটা কিন্তু হয় না। পরখ করে দেখতে পারো অন্য আঁক দিয়ে। তাহলে শূন্যের একটা গুণ পেলাম। জবর গুণ। একটা সংখ্যাকে দশগুণ বাড়াবার গুণ। একেই বলে দশমিক গুণোত্তর ব্যবস্থা। সোজা কথা—দশ দশ গুণ করে বাড়াবার কায়দা।

এ অব্দি যা হ'ল— তাকে কী বলে জানো?

বলে— কথায় ধন্য, কাজে শূন্য।



কেননা — শূন্য একটা সংখ্যার সবার আগে থাকলে মানে হয় না কেন — সে কথার জবাব তো পাওয়া যায়নি এখনও।

হুঁ হুঁ — কে বলে মানে হয় না?

সবার আগে থাকলে মানে হয় না বলেই তো একটা কথা দিব্যি বোঝা যায়। ০-টা একটা আঁক। বলা যেতে পারে একটা মার্কা বা ছাপ। শহরের রাস্তায় থাকা জেব্রা দাগের মতো। জেব্রা দাগটা তো একটা চিহ্ন। মানে হ'ল — পায়ে হেঁটে ওই খান দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে। বিপদ হবে না। গাড়ির ড্রাইভাররা ঐ দাগের কাছাকাছি এলে — সাবধানে চালায়। পুলিশও থাকে অনেক সময়—তা দেখার জন্যে। জেব্রা দাগের মতো ০ একটা চিহ্ন। নিচের খেলাটা পরখ করলেই বোঝা যাবে খুব সহজে। নিচের ছবিতে গোটা পাঁচেক সংখ্যা দেওয়া হ'ল—

০১, ১০, ১০০, ১০১, ০০১

১০০ আর ১০১-এ ফারাক কোথায়? ১-এর পাশে দুটো শূন্য। দুটোই শূন্য বটে — তবে দুটোর মানে দুরকম।

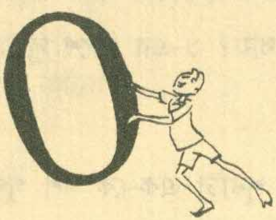
১-এর ডান দিক থেকে পয়লা শূন্যটা এক-কে দশ গুণ বাড়িয়েছে।

১ x ১০ = ১০। পরের শূন্যটা — যেটা মাঝখানে আছে — সেটা আরো ১০ গুণ বাড়াচ্ছে। মানে — ১০ x ১০ = ১০০ হচ্ছে। আগে ছিল ১০। তাকে আরো ১০ গুণ বাড়িয়ে হ'ল ১০০। এভাবে যত খুশি বাড়ানো যায়। এভাবে সারা জীবন ধরে বাড়িয়ে গেলেও শেষ সংখ্যার নাগাল পাওয়া যাবে না।

তারপর দেখো— রয়েছে ১০১। যাকে বলে একশ এক। মাঝে শূন্যটা না থাকলে কি হতো? এগারো, মানে ১১ হতো। মাঝে ০ দেওয়াতে হয়ে গেল একশ এক, এগারোর জায়গায়। শেষের ১ এর জায়গায় ২ থেকে ৯ অব্দি যে আঁকই বসাও না কেন — সামনের ১-কে একশ থেকে সরায় কার সাধ্যি। বিষয়টা সংখ্যায় আর কথায় পাশাপাশি লিখলে চটজলদি ধরা পড়ে যায় ডান দিকের ছবিটা দেখলেই। বোঝা যাবে কোথা থেকে কী হচ্ছে।

তাহলে দাঁড়ালটা কী?

মাঝের শূন্যটার কাজ হচ্ছে সামনের ১-কে একশ-র ঘরে ধরে রাখা।
মাঝে আরও একটা শূন্য ঢুকলে ১ চলে যাবে এক হাজারের ঘরে। সংখ্যাটা হবে ১০০১। শূন্যের





১০১ = একশ এক

১০২ = একশ দুই

১০৩ = একশ তিন

১০৪ = একশ চার

১০৫ = একশ পাঁচ

১০৬ = একশ ছয়



১০৭ = একশ সাত

১০৮ = একশ আট

১০৯ = একশ নয়

এই কেরামতি দেখেই তো কোনো এক কবি গেয়েছেন — শূন্য! তুমি শুধু শূন্য নহ।

এই কেরামতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে শূন্যটা হ'ল একটা ছাপ। একটা মার্কা। যাকে বলে একটা চিহ্ন। আঁক। সাধুভাষায় বলে — অঙ্ক। অঙ্কটা যখন জায়গামতো বসে, একলা কিংবা কারোর সঙ্গে কতকগুলো ঘটনা কিংবা জিনিসটিনিসের গোনাগুনতি বোঝাতে — তখন সে হয়ে যায় সংখ্যা।

শূন্যের বেলায় যেমন হয়, ১ থেকে ৯ আঁকের বেলাও এটা সত্যি। শূন্যভায়া আসার পর অঙ্ক আর সংখ্যার তফাৎটা ধরা পড়ল।

যেমন—

কিচ্-ছু নেই বোঝাতে = ০

একটা জিনিস বোঝাতে = ১

দুটো জিনিস বোঝাতে = ২

তেমনি—

আটটা জিনিস বোঝাতে = ৮

ন'টা জিনিস বোঝাতে = ৯

আর ১০টা জিনিস বোঝাতে হ'লে হবে = ১০



তাহলে ০ অঙ্কও বটে, আবার সংখ্যাও বটে। এই একই কায়দায় দেখানো যায় ১ থেকে ৯ ছাপগুলো অঙ্কও বটে, আবার সংখ্যাও বটে।

তাহলে আমরা পেলাম মোট দশটা অঙ্ক। যা দিয়ে সব সংখ্যাই লেখা যায়। অঙ্কগুলো কী কী?

অঙ্কগুলো হ'ল — ১, ২ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০

লিখতে বললে — এভাবেই লেখে অনেকে। কিন্তু ০ টা ৯-এর পরে কেন? ও কি ৯-এর থেকে বড়? তা-তো নয়। বরং সব থেকে ছোট। ১-এর থেকেও। হিসেব মত ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ হ'লেই তো ঠিক হয়। বাসে চড়ার সময় ছোটদের তো আগে তোলে। তারপর বড়রা।

আসলে— ০-কে মানুষ বের করেছে সবার শেষে — মানে সব অঙ্কের শেষে। তাই সবার পরে বসে অঙ্কদের লাইনে। লাইনে দাঁড়াতে হ'লে যে পরে আসে তাকে পরেই দাঁড়াতে হয়। দেরিতে আসা শূন্যকে তাই যেতে হয় ৯-এরও পরে। হায় — সবার শেষে পৃথিবীতে আসার কি ঝামেলা।



শূন্যটা যে অঙ্কও বটে, আবার সংখ্যাও বটে তা বোঝা যাবে নিচের গোনার কাজটা করলে।

অঙ্ক হিসাবে শূন্য	সংখ্যা হিসাবে শূন্য
১ + ১১ =	১ + ০ =
১০ + ১ =	০ + ১ =
১ − ১০ =	১ − ০ =
১০ − ১ =	০ − ১ =
১ × ১০ =	১ × ০ =
১০ × ১ =	০ × ১ =
১ ÷ ১০ =	০ × ০ =
১০ ÷ ১ =	০ ÷ ১ =
১০ ÷ ১০ =	১ ÷ ০ =
	০ ÷ ০ =

বাঁ দিকের সারিতে গোনার কাজ করলে আমরা পাই— ১১, ১১, -৯, ৯, ১০, ১০, ১/১০, ১০, ১

ডান দিকের সারিতে ওপর থেকে পর পর সাতটা গোনার কাজ করলে পাই— ১, ১, ১, -১, ০, ০, ০। ৮নং টা হল ০ ÷ ১। ভাগটা করলে কী পাব? পাব ০/১ = ০।

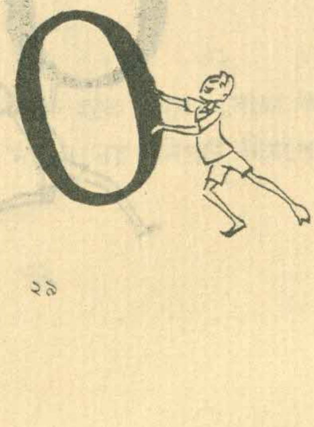
এর মানে হ'ল — শূন্যকে অন্য যে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলটা সদাই শূন্য হবে। শূন্যেরই খালি ঐ গুণটি আছে। কেননা — ০ × ১ = ০ হয়। তাহলে ০ ÷ ১ = ০ হবে। যেমন — ৩ × ৫ = ১৫; আবার ১৫ ÷ ৫ = ৩।

১-কে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কী হবে?

মানে, ১ ÷ ০ = কত?

কিছুই হবে না। আগের মতো হিসেব করলেই বোঝা যাবে সহজে। ১ ÷ ০ মানে ১/০। ১/০ = কত হবে? যাকে ০ দিয়ে গুণ করলে ১ পাওয়া যাবে। ধর ১ ÷ ০ = ক এখন ক × ০ = ১ হতে হবে। আমরা শিখেছি কোনো সংখ্যাকে ০ দিয়ে গুণ করলে ০ হয়। ১ হয় না কখনো। সোজা কথায় — এটা হয় না। শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না।

কিন্তু ০ ÷ ০ দিয়ে ভাগ করলে কী হবে?



অ-নে-ক কিছুই হতে পারে।

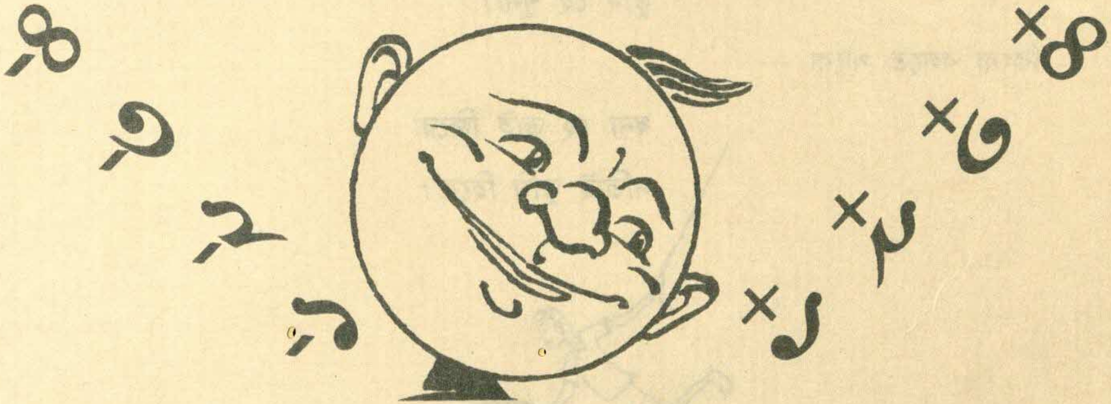
যেমন—

০ × ০ = ০;	অতএব ০ ÷ ০ = ০
তেমনি ০ × ১ = ০;	অতএব ০ ÷ ০ = ১
০ × ২ = ০;	অতএব ০ ÷ ০ = ২
০ × ১৫ = ০;	অতএব ০ ÷ ০ = ১৫

সারা জীবন ধরে করে গেলেও শেষ ভাগফলের নাগাল পাওয়া যাবে না। ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি — *'শূন্য হ'ল একমাত্র সংখ্যা যাকে অন্য যে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়। কিন্তু অন্য কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না।'*



শূন্য নিয়ে আরো একটা মজার ব্যাপার আছে। টিভি-তে তো আজকাল নানান জায়গার তাপমাত্রা জানায়। যেমন, ৪০° সেলসিয়াস, -২° সেলসিয়াস, -৫° সেলসিয়াস, ইত্যাদি। সেলসিয়াস হ'ল তাপের একক। কিন্তু কখনো কি আমরা -০° সেলসিয়াস শুনেছি বা দেখেছি কখনও? না— শুনিনি। দেখিনি। একটু সংখ্যাগুলো পর পর সাজালে মজাটা ধরা পড়বে বেশ।



...., ..., -৪, -৩, -২, -১, ০, +১, +২, +৩, +৪, ..., ...,

আর সব সংখ্যা হ্যাঁ-বাচক হতে পারে, না-বাচক হতে পারে। সোজা কথায় — আছে-বাচক আর নেই-বাচক। কিন্তু শূন্যের বেলা? 'হ্যাঁ'-ও নয়, 'না'-ও নয়। নিপাট নিরপেক্ষ। এদিকে নয়, ওদিকেও নয়। শূন্য বাবাজির এ এক মস্ত বড় গুণ।

ওপরের দুটো গুণ খালি শূন্যেরই আছে। আর কোনো সংখ্যার নেই। কে বলে শূন্যবাবাজি নির্গুণ। কত গুণের গুণমনি। দশটা আঁকের মধ্যে ও একলা। অন্যরকম। লক্ষ, কোটি সংখ্যার রাজ্যে শূন্য হ'ল একমেবদ্বিতীয়ম্। মানে — যে একলা, যার জোড়া নেই। এ সব জানার পর — কার না বলতে ইচ্ছে করে —

ধন্য হে ধন্য

তুমি হে শূন্য।

কিংবা বলতে পারো —

ধন্য হে ভাই জিরো

সত্যিই তুমি হিরো।



NBA

মূল্য ঃ ২০/-